বঙ্গজ ক্রীড়াসাহিত্য: চিহ্ন, বিকাশ, রূপান্তর

[BANGOJO KRIRASAHITYO: CHINHO, BIKAS, RUPANTAR]

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে
পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

রাহুল পণ্ডা

তত্ত্বাবধায়ক

ড. স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা, ভারত
২০২৪

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়।। উপমহাদেশের ক্রীড়াসংস্কৃতি: সংক্ষিপ্ত বীক্ষণ

দ্বিতীয় অধ্যায়।। ক্রীড়াসাহিত্যের সংরূপগত সংজ্ঞায়ন, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্য এবং সেই নিরিখে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের শিকড়সন্ধান (প্রাগাধুনিক আমল থেকে দেশভাগ)

তৃতীয় অধ্যায়।। সাতচল্লিশ পরবর্তী দুই দশক: জনরুচির চাহিদা এবং বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিলান্যাস

চতুর্থ অধ্যায়।। সাতের দশক এবং মতি নন্দী: বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের পক্ষবিস্তার

পঞ্চম অধ্যায়।। আটের দশক: খেলাবিষয়ক পত্রিকা এবং তার লেখকগোষ্ঠী

ষষ্ঠ অধ্যায়।। মুক্তবাণিজ্য থেকে মিলেনিয়াম: ক্রীড়াসাহিত্যের রঙবদল

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

বঙ্গজ ক্রীড়াসাহিত্য: চিহ্ন, বিকাশ, রূপান্তর

প্রস্তাবনা

বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের উৎস অনুসন্ধান এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের ধারাকে খতিয়ে দেখার প্রচেষ্টা বর্তমান গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য। সাধারণত যে কোনো গবেষণাধর্মী আলোচনার ক্ষেত্রে গোড়াতেই তার তাত্ত্বিক দিকটি পরিষ্কার হওয়া জরুরি। আলোচ্য সারসংক্ষেপে যেমন জানা প্রয়োজন 'ক্রীড়াসাহিত্য' বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। বাংলা ভাষায় রচিত সেই ধরনের টেক্সটগুলিকে ক্রীড়াসাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছি আমরা, যাদের বিষয়বস্তু এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে খেলা। এই খেলা যেকোনো ধরনের হতে পারে, কিন্তু টেক্সটের মূল গতিপথটি যেন তাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। লেখার মধ্যে খেলার প্রসঙ্গ থাকলেই ক্রীড়াসাহিত্য, এহেন সরলীকরণকে আপাতত মুলতুবি রাখা হচ্ছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রীড়া বিষয়ক ধ্যানধারণা বেশ প্রাচীন। হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো হোক বা বৈদিক আমল; খেলাধুলার নানান ঐতিহাসিক সূত্র ছড়িয়ে আছে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত বইপত্রে। তুলনায় প্রচুর না হলেও প্রাগাধুনিক বাংলা গ্রন্থাদিতেও নমুনা মেলে গৌড়বঙ্গের মানুষের ক্রীড়াপ্রেমের। কিন্তু খেলার চর্চা থাকলেই যে খেলা নিয়ে সাহিত্য রচিত হবে, এমন নয়। নতুন ধারার সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ভিন্নধারার চর্চা এবং মানসিকতার প্রয়োজন। যুগগত দাবিও সেখানে একটি জরুরি অনুঘটকের কাজ করে।

স্বভাবতই ক্রীড়াসাহিত্য বলতে যে সংরূপটি আমরা বুঝতে চাইছি তার জন্ম প্রাগাধুনিক সময়ে হয়নি। তার মূল ধাঁচটি বৈদেশিক এবং তার উদ্ভব রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় দেহচর্চার অভিপ্রায় থেকে। পরবর্তীযুগে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে তাদের সাথে ক্রীড়াচর্চার দৈহিক এবং তাত্ত্বিক ভাবনাগুলিও উপনিবেশে সম্প্রসারিত হয়। ইউরোপীয়রা কেবল দেশ দখল করেনি, সেই সাথে মূলনিবাসী মানুষদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং

বিনোদনের উপাদানগুলিকেও কাটছাঁট করে নিয়েছিল নিজেদের অভিপ্রায় অনুসারে। আধুনিক ক্রীড়াসাহিত্যের জন্ম ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায়। উত্তরকালে তার প্রভাব ক্রমশ বাংলা ভাষায় জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সেই অনুকৃতীর সূত্রেই দেশভাগ পরবর্তী সময়ে তা স্বীকৃতি পেতে শুরু করে স্বকীয় একটি সংরূপ হিসেবে।

সদর্থে বাংলা ভাষায় প্রথম যে ক্রীড়াসাহিত্যের বইটি আমরা পাই, সেটি হল 'ইডেনে শীতের দুপুর', লেখক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, প্রকাশকাল ১৯৬০। এই বইয়ের ভূমিকায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন, *'...ক্রিকেট-বিষয়ে বঙ্গভাষায় এটি প্রথম গ্রন্থ না হোক, প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ।'* (শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বাছাই ক্রিকেট', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৪০৬, পৃ -৮) এখানে 'প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ' শব্দ দু'টি জরুরি, কেননা ইতিপূর্বে ক্রিকেট নিয়ে একাধিক বইপত্র লেখা হলেও, (বিনয় মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'খেলার রাজা ক্রিকেট', 'মজার খেলা ক্রিকেট' ইত্যাদি), সেগুলি সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারেনি। শঙ্করীপ্রসাদের বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাষাগত প্রসাদগুণে এই সম্ভাবনা দেখা দিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সাত বছরে আরও পাঁচটি ক্রিকেটের বই লিখে বাংলা ভাষায় খেলা নিয়ে সাহিত্যচর্চার নান্দীপাঠ শঙ্করীপ্রসাদ সম্পন্ন করেন।

এরপরে সাতের দশকে আবির্ভাব ঘটে মতি নন্দীর। শঙ্করীপ্রসাদ যে সম্ভাবনার রাস্তা দেখিয়েছিলেন, মতি নন্দী তাকে আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। একাধারে সাহিত্যিক এবং ক্রীড়াসাংবাদিক মানুষটি শুধু রম্যরচনা বা ব্যক্তিগত গদ্যের মধ্যে খেলাকে আটকে না রেখে মুক্তি দেন কথাসাহিত্যের ব্যাপকতর প্রাঙ্গণে। সেইসঙ্গে তাঁর লেখায় আশ্রয় পায় সব ধরনের মানুষ, সব ধরনের খেলা। সত্তরের উত্তাল দিনগুলিতে তাঁর খেলাকেন্দ্রিক একের পর এক গল্প-উপন্যাস সাড়া ফেলে সমস্ত বয়সের পাঠকের মনে। বেশ বোঝা যায় খেলার লেখালিখি কৈশোরের চাপল্য কাটিয়ে ক্রমশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে যৌবনের গাম্ভীর্য।

আবার আটের দশকের গোড়ায় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে একঝাঁক খেলার ম্যাগাজিন। এই পত্রিকাগুলির মধ্যে 'খেলার আসর', 'খেলার কথা', 'খেলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রাত্যহিক রোজনামচার বাইরে গিয়ে খেলার দুনিয়ার আরও গভীর তত্ত্বতালাস

এবং বিস্তারিত বিষয়ভাবনার খোঁজ মিলল এইসব পত্রিকাতে। পাশাপাশি পত্রিকাগুলি একাধিক লেখকগোষ্ঠীর জন্ম দিতেও সক্ষম হয়। এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দাশগুপ্ত, অলক চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা মতি নন্দীর কেটে যাওয়া খড়ির দাগকে আরও প্রসারিত করেন। কিছুক্ষেত্রে মতি নন্দীকে অস্বীকার করেই গড়ে তোলেন নিজস্ব ন্যারেটিভের ভাষ্য।

নয়ের দশকে এসে বিশ্বায়ন এবং মুক্ত অর্থনীতির প্রভাবে উপমহাদেশের ক্রীড়াসংস্কৃতির খোলনলচে পালটে যায়। খেলা আর নিছক খেলা থাকে না, বিপণনের এক বৃহৎ বাজার হিসেবে তা গণ্য হতে শুরু করে, ইতি-নেতির এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব খেলাকে গ্রাস করে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে লেখালিখির ক্ষেত্রে। রূপক সাহা, সব্যসাচী সরকার, গৌতম ভট্টাচার্য, তৃষিত বর্মন, দেবাশিষ দত্তের মতো একঝাঁক নতুন লেখক উঠে আসেন, যাঁরা লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন এই পালটাতে থাকা ক্রীড়াপরিসরের অনুপুঙ্খ চিত্র। পরবর্তী দশকগুলিতে এই মানসিকতার বিশেষ হেরফের ঘটেনি।

সব মিলিয়ে যে কোনো চলিষ্ণু বিষয়ের মত বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যও একটি ধারাবাহিক পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে এবং যুগান্তরে ভিন্নমাত্রিক হয়ে উঠেছে। ষাট-সত্তরের দিনগুলি থেকে একুশ শতক - পালটে যাওয়া প্রহরে, খেলা ঘিরে পালটে যাওয়া অভিজ্ঞতার কথা লেখকরা তুলে এনেছেন তাঁদের কলমে। পাঠকরুচি এবং আধুনিকতার দাবি মেনে লেখার অন্তরাত্মা ও আখ্যানকাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে, ক্রমশ পরিণত এবং ঝকঝকে হয়েছে বাহ্যিক উপস্থাপনা। বস্তুত এই ধারাবাহিক সাহিত্য প্রচেষ্টা এবং বিবর্তনের কারণে বাংলায় খেলাকেন্দ্রিক লেখালিখি ক্রমশ একটি বিশিষ্ট সাহিত্যঘরানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূল ধারার সাহিত্যের সঙ্গে আজ তাই ক্রীড়াসাহিত্যও সারগর্ভ গবেষণার দাবি রাখে।

বর্তমান গবেষণাটি প্রস্তাবনা এবং উপসংহার বাদে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। গবেষণার প্রয়োজনে মূলত ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতির আশ্রয়ও নেওয়া হয়েছে, যেমন – প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

প্রথম অধ্যায়

উপমহাদেশের ক্রীড়াসংস্কৃতি: সংক্ষিপ্ত বীক্ষণ

খেলার ইতিহাস না বুঝলে খেলার সাহিত্য বোঝা কঠিন; তাই প্রথম অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার লক্ষ্য হল প্রাগাধুনিক সময় থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উপমহাদেশের ক্রীড়াসংস্কৃতির একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করা।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর (২৫০০-১৫০০ খ্রি.পূ.) যে ভগ্নাবশেষ এবং দেওয়ালচিত্র পাওয়া যায়, সেখানে 'dice' বা পাশার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পাওয়া যায় শিকার এবং মুষ্টিযুদ্ধের চিত্র। শিকারের ছবিতে তোরণ এবং চক্র দেখতে পাওয়া যায়, যা আধুনিক জ্যাভলিন এবং ডিসকাসের সমতুল্য। এছাড়া পাওয়া গেছে প্রচুর মাটির খেলনা, দাবার গুটি। অনুমান করা যেতে পারে এসবই ছিল সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের উপাদান।

বৈদিক আমলে প্রধানত দুই ধরনের ক্রীড়াপ্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিকে যোগচর্চার মতো গূঢ় শারীরিক চর্চা, অন্যদিকে যুদ্ধকলা। বিশেষত এই দ্বিতীয় দিকটি, অর্থাৎ যুদ্ধ এবং ক্রীড়ার যৌথতা; সুবিস্তারে মান্যতা পেয়েছে রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্যগুলির পাতায়। মুষ্টিযুদ্ধ, অশ্বারোহণ, মল্লযুদ্ধ, অসিচালনা ইত্যাদি একাধারে ছিল মনোরঞ্জন এবং আত্মরক্ষার উপায়। অধিকাংশ খেলা সেসময় তাই নৃশংস এবং রক্তক্ষয়ী। তবে এটি উপমহাদেশের স্থানিক বৈশিষ্ট্য বলে ভাবলে ভুল হবে। একই সময়কালে গ্রীস এবং ম্যাসিডোনিয়ায় শুরু হওয়া ক্রীড়াউদ্যোগগুলির মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় একই ধরনের নির্মমতা।

পরবর্তী ইসলামি শাসনের যুগে পরিচয় মেলে ভিন্ন একধরনের ক্রীড়াসংস্কৃতির। আকবরের সভাকবি আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরি' এবং 'আকবরনামা' বই দুটিতে ষোড়শ শতাব্দীর খেলাধুলোর যে ঘনিষ্ঠ বিবরণ রেখে গেছেন, তাতে বিভিন্ন ধরনের খেলার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। ফজল 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে খেলাকে ভাগ করেছেন দুটি শ্রেণিতে - ইন্ডোর গেমস (যেমন

চৌপর নামে একধরনের লুডো, দাবা, তাস ইত্যাদি) এবং আউটডোর গেমস (ইসকবাজি বা পায়রা ওড়ানো, চৌগণ বা পোলো, শিকার ইত্যাদি)।

উপমহাদেশের খেলার ছবিটি বদলে যায় কোম্পানির শাসন শুরু হওয়ার পর। 'Wherever an Englishman goes, he takes his games with him' - এই চলতি প্রবাদখানিকে সত্যি প্রমাণ করে উপমহাদেশের ক্রীড়াসংস্কৃতিকেই আমূল পালটে দেয় তারা। নির্দিষ্টভাবে চারটি খেলা - ফুটবল, ক্রিকেট, ফিল্ড হকি এবং টেনিস, উপমহাদেশে ব্রিটিশদের দান। এছাড়াও তালিকায় থাকবে ব্যাডমিন্টন, রাগবি, বিলিয়ার্ডস, গলফ, রোয়িং ইত্যাদি। এমনিতেই শরীরচর্চার প্রতি আলাদা ঝোঁক ইউরোপিয়ানদের আগাগোড়া। নির্বান্ধব কলোনিতে এসে সেই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশদের প্রচলিত ক্রীড়া-চালচিত্রে প্রথম প্রভাবিত হয় বাংলার মানুষ। মূলত ব্রিটিশদের সঙ্গে নৈকট্যই এর কারণ। কিন্তু নিছক বিনোদনের মধ্যে এই সম্পর্ক আটকে থাকেনি। বরং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তা মোড় নেয় বিবিধ জাতীয়বাদী প্রতিস্পর্ধায়। হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ, মোহনবাগানের শিল্ডজয় ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী মানসিকতার দ্যোতক হিসেবে খেলা ব্যবহৃত হতে থাকে।

দেশভাগ-উত্তর সময়ে স্বাধীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের খেলা ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে। দিল্লিতে এশিয়ান গেমস আয়োজিত হয়। কলকাতায় ফুটবল এবং অবশিষ্ট ভারতে ক্রিকেট জনপ্রিয়তা লাভ করে। ছাপান্নর অলিম্পিকে কে ডি যাদব কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জেতেন। পাঠকচাহিদা মেটানোর জন্য সংবাদপত্রগুলিতে আলাদা করে বরাদ্দ হতে শুরু করে খেলার পাতা। সূচনা হয় ক্রীড়াসাংবাদিকতার। সব মিলিয়ে খেলা ঘিরে গড়ে ওঠে এক ধরনের সিরিয়াস চর্চা এবং উন্মাদনা।

নয়ের দশক থেকে পরিস্থিতি আবার বদলাতে থাকে। মুক্তবাণিজ্যের দ্বার খুলে দেওয়ার ফলে উপমহাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে একটি বাণিজ্যিক পরিসর তৈরি হয়। ইওরোপ এবং আমেরিকার অর্থলগ্নি শক্তিগুলি ভারতের বাজার ধরার জন্য খেলাতে অঢেল মুদ্রা বিনিয়োগ করতে শুরু করে। প্রাথমিকভাবে এই বিনিয়োগ ক্রিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, ফুটবল ইত্যাদিতে। স্বভাবতই প্রচুর অর্থ এবং প্রচুর বিনিয়োগের চিহ্ন এখন আধুনিক ক্রীড়ার অলঙ্কার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রীড়াসাহিত্যের সংরূপগত সংজ্ঞায়ন, আন্তর্জাতিক বৈচিত্র্য এবং সেই নিরিখে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের শিকড়সন্ধান (প্রাগাধুনিক আমল থেকে দেশভাগ)

এই অধ্যায়টি ভাবা হয়েছে মূলত দুই ধরনের জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে। প্রথমত, ক্রীড়াসাহিত্য বলতে আমরা কী বুঝি? তার কোনো সংজ্ঞা বা তাত্ত্বিক কাঠামো রয়েছে কিনা। দ্বিতীয়ত, যদি তাত্ত্বিক কাঠামো থাকে সেই অনুসারে কী ধরনের সাহিত্যরচনার প্রয়াস বাংলাভাষায় প্রাথমিক পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়?

রসবিচারের গোড়াতেই কিন্তু হোঁচট খেতে হয়। সমালোচনা গ্রন্থগুলি এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে না। পরিভাষাগত অভিধানগুলিতেও ‘ক্রীড়াসাহিত্য’ সম্পর্কে খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় না প্রায় কোনো তথ্য। সাধারণ সহজিয়া যুক্তিতে ‘ক্রীড়াসাহিত্য’ শব্দটিকে মাঝ বরাবর ভেঙ্গে ফেললে হয়তো বা একরকম মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের আভাস তৈরি হয়; ক্রীড়া বিষয়ক সাহিত্যই হল ক্রীড়াসাহিত্য। অর্থাৎ কিনা খেলা নিয়ে লেখা, বা যে লেখার প্রতিপাদ্য খেলা। কিন্তু এই ধরনের সরলীকরণে সমস্যা হল তাতে উত্তর পাওয়া যায় না বিবিধ প্রশ্নের। যেমন লেখার মধ্যে খেলা কতটা ঠাঁই পাবে? খেলা নিয়ে যেকোনো লেখালিখিই কি ক্রীড়াসাহিত্যের অন্তর্গত? তার মধ্যে কতখানি সাহিত্য, কতখানি খেলা, কোন জল-অচল ভেদ নেই কি?

তাই কিছুটা বাধ্য হয়ে গবেষণার স্বার্থে উত্তরটি আমাদের তৈরি করে নিতে হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় ক্রীড়াসাহিত্য বলতে সেই ধরনের টেক্সটগুলিকে চিহ্নিত করতে চাওয়া হচ্ছে, যাদের বিষয়বস্তু এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে খেলা। এই খেলা যে কোনো ধরনের হতে পারে, কিন্তু টেক্সটের মূল গতিপথটি যেন তাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে। বা অন্যভাবে বললে খেলা ছাড়া টেক্সটিকে ভাবা যাবে না। যে কারণে মতি নন্দীর লেখা উপন্যাস ‘কোনি’ বা শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘চ্যাম্পিয়ন’ আমাদের আলোচনায় ক্রীড়াসাহিত্য হিসেবে গৃহীত হলেও

স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর উপন্যাস ‘পাতা ঝরার মরশুমে’ বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘বক্সার রতন’ গৃহীত হবে না।

এই সংজ্ঞা মাথায় রেখে অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আমরা ক্রীড়াসাহিত্যের প্রাথমিক শিকড়সন্ধানের চেষ্টা করেছি। উপমহাদেশের প্রাগাধুনিক সাহিত্যের দীর্ঘ ইতিহাসে, পুরাণ এবং মহাকাব্যের আমল থেকে রেনেসাঁর সীমা পর্যন্ত, যে ধরনের লেখালিখি আমাদের হাতে আসে সেখানে খেলাভিত্তিক বা খেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় কোনো লেখার উদাহরণ পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা ক্রীড়াপ্রসঙ্গ। যেমন মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবদের শিক্ষাপর্বে, চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের মানসোল্লাস গ্রন্থে, চর্যাপদের ১২ নং পদে, পদ্মাবতী আখ্যানে বা বিবিধ পুরাণে। এই উল্লেখগুলিকে ক্রীড়াসাহিত্য বলে ভুল করার কারণ নেই। কারণ এইসব টেক্সটের প্রধান বক্তব্য বা বর্ণিতব্য বিষয় ভিন্ন কিছু। তবে বিচ্ছিন্ন উদাহরণ একদম নেই এমন নয়।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক মহাকবি পিণ্ডার বেশ কিছু ওড লিখেছিলেন অলিম্পিক এবং সেখানে অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের নিয়ে। বীরত্বের বন্দনায় উচ্ছ্বসিত সেই কবিতাগুলিকে প্রাচীনতম ক্রীড়াসাহিত্যের নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু পিণ্ডারের প্রচেষ্টা একটি ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম মাত্র। পিণ্ডারের উত্তরসাধকের খোঁজ দীর্ঘকাল মেলেনি গ্রীস বা অন্যান্য দেশের সাহিত্যভাণ্ডারে।

সেই খোঁজ পাওয়া গেল নবজাগরণ পরবর্তী ইউরোপে। শরীরচর্চা সেই সময়ে একটি জরুরি মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে। সুগঠিত শরীরকে ধরে রাখার প্রয়াসে ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছিল বিভিন্ন ধরনের খেলা। আর সেই খেলার উৎসাহ থেকে কিছু কিছু ক্রীড়াসাহিত্য লেখার প্রয়াসও দেখা যাচ্ছিল। ১৭০৬ সালের মার্চ মাসে উইলিয়াম গোল্ডউইন ল্যাটিন ভাষায় লিখে ফেলেন ৯৫ পংক্তির একটি কবিতা ‘কাটারমেন পিলায়’ (‘অন আ ম্যাচ অ্যাট বল’)। এরপর ১৭৪৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয় জেমস লাভের ইংরেজি ভাষায় লেখা ৩১৬ পংক্তির সুদীর্ঘ কবিতা ‘অ্যান হিরোইক পোয়েম’, যার একটি কাপলেট পরবর্তীকালে মুখে মুখে ফিরতো, ‘হেইল ক্রিকেট! গ্লরিয়াস ম্যানলি ব্রিটিস গেম! ফার্স্ট অফ অল স্পোর্টস! বি ফার্স্ট এলাইক ইন ফেম!’ এই ধরনের সাহিত্যপ্রয়াসের মধ্যে ১৮৫৭-তে ব্রিটিশ সাহিত্যিক টমাস

হিউজেস লিখে ফেলেন একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস 'টম ব্রাউন'স স্কুল ডেজ'। এই বইতে বিশদ বিবরণ সংযুক্ত হয়েছিল ব্রিটিশ স্কুলগুলির ক্রীড়াচর্চার, এবং সেই খেলার ঝোঁক কীভাবে শৈশবে চরিত্রগঠনে সহায়তা করে সে বিষয়ে যুক্ত হয়েছিল লেখকের মূল্যবান মন্তব্য। উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে, এবং এই প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ রচনার আভাস পাওয়া যায়, যার সারবস্তুটি মূলত খেলা।

তবে ক্রীড়াভিত্তিক সাহিত্যরচনার সর্বাত্মক প্রচার এবং প্রসার কিন্তু তখনও সম্ভব হয়নি। সেটি হল বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে মার্কিন লেখকদের হাত ধরে। একের পর এক কালজয়ী গল্প-উপন্যাস; যেমন জ্যাক লন্ডনের 'দ্য মেক্সিকান' (১৯১১), রিং লার্ডনারের 'ইউ নো মি অল' (১৯১৬), আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ফিফটি গ্র্যাণ্ড' (১৯২৭), বাড শুয়লবার্গের 'দ্য হার্ডার দে ফল' (১৯৪৭), বার্নার্ড ম্যালামুডের 'দ্য ন্যাচারাল' (১৯৫২) ইত্যাদি এই সময়েই আছড়ে পড়তে শুরু করে পাঠক মহলে। মূলত দুটি খেলা, বক্সিং এবং বেসবল, যারা বস্তুত ছিল মার্কিন পপুলার সংস্কৃতির দ্যোতক, তাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এই সাহিত্যচর্চা। মার্কিন লেখকদের পাশাপাশি বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক, স্যার জন ফ্রেডরিক নেভিল কার্ডাস, সম্ভবত যিনি কলম না ধরলে ক্রীড়াসাহিত্যের মধ্যে 'ক্রিকেট লিটারেচার' বা 'ক্রিকেটসাহিত্য' নামক একটি সাহিত্যের ধারার জন্ম হতো না। কার্ডাস ক্রীড়াসাংবাদিকতার এমন একটি ঘরানার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা নির্দ্বিধায় উচ্চমানের সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কার্ডাসের কাছে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্য বিশেষভাবে ঋণী। বাংলা ক্রীড়াসাংবাদিকতার প্রথম যুগের কাণ্ডারী যাঁরা, অর্থাৎ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, বেরী সর্বাধিকারী, মতি নন্দী, কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তো বটেই, পরবর্তী যুগের সাংবাদিকরাও, যেমন অশোক দাশগুপ্ত, গৌতম ভট্টাচার্য, সব্যসাচী সরকার, দেবাশিষ দত্ত, রূপায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ কার্ডাসের সাহিত্যিক ব্যুৎপত্তির দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের কিছু কিছু প্রয়াস সূচিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে। প্রথম যুগের এই লেখাগুলির মধ্যে তিনটি পৃথক দৃষ্টিকোণ দেখতে পাওয়া যায়। এক, জাতীয়তাবাদী ধারা, যেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জায়মান স্বদেশীভাবনাকে সাহিত্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। দুই, লঘু রম্যরচনা। তিন, গ্রামগঞ্জে প্রচলিত বিভিন্ন দেশজ খেলার

বিবরণ। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সাহিত্যিকরা এই বিভিন্ন ধারায় কিছু কিছু আখ্যান রচনা করেছিলেন। এই সব সাহিত্যপ্রয়াস, আপাতদৃষ্টিতে ক্রীড়াসাহিত্যের সংজ্ঞায় সবসময় না আঁটলেও, পরবর্তী প্রজন্মের ক্রীড়ামোদী সাহিত্যপাঠকের কাছে সময়ের দলিল হিসেবে মূল্যবান।

তৃতীয় অধ্যায়

সাতচল্লিশ পরবর্তী দুই দশক: জনরুচির চাহিদা এবং বাংলা ক্রীড়া সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক শিলান্যাস

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের কিছু প্রাথমিক নমুনা ও তাদের মধ্যেকার দোলাচল উল্লেখ করা হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানে খেলাকে ব্যবহার করা হয়েছে হাসি-ঠাট্টা বা ন্যাশানালিজমের অংশ হিসেবে। কিন্তু সে অর্থে বিশুদ্ধ ক্রীড়াসাহিত্যের জন্ম তখনও সম্ভব হয়নি। বর্তমান পরিচ্ছেদে সেই জন্মকথা এবং কী পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হল; তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আমবাঙালির মধ্যে খেলা ঘিরে ভিন্ন গোত্রের একটি আগ্রহ ও সচেতনতার শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। এই সময়ে ক্রিকেট-ফুটবলের মতো জনপ্রিয় খেলাগুলোয় ভারত ক্রমশ আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেতে শুরু করলে, এবং ময়দানি ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এই দু'টি ক্লাব অজস্র সমর্থকের আবেগ-আকাঙ্ক্ষার আশ্রয় হয়ে উঠলে, খেলার খবর নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাহিদা তৈরি হতে শুরু করে। ফলে সংবাদপত্রগুলোও এই চাহিদাগত চিদবৃত্তি পূরণের উদ্দেশ্যে ক্রীড়াসাংবাদিকতার জন্য স্বতন্ত্র পরিসর ধার্য করে। প্রকাশিত হতে শুরু হল বিভিন্ন ধরনের খেলার খবর, ম্যাচ রিপোর্টিং, সাক্ষাৎকার, বিশেষজ্ঞের মতামত ইত্যাদি।

এই প্রেক্ষাপটে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর আবির্ভাব। বেরী সর্বাধীকারী, রাখাল ভট্টাচার্য, বিনয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এই সময় পর্বে খেলা নিয়ে লেখালিখি করলেও শঙ্করীপ্রসাদকে নিঃসন্দেহে

বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের অগ্রদূত বলা যায়। খেলা নিয়ে যে সিরিয়াস সাহিত্যচর্চা সম্ভব তা তিনিই প্রথম পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত ক্রিকেট বিষয়ক তাঁর প্রথম বই 'ইডেনে শীতের দুপুর' এই মানসিকতার সাক্ষ্য বহন করে। বৈঠকি চালে, আড্ডার সুখযাপনে লেখা এই বইখানিতে লেখক খেলা ঘিরে তাঁর অতীত অভিজ্ঞতা এবং আত্মিক সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। তার থেকেও যা জরুরি খেলা নিয়ে সাহিত্য করার সচেতন প্রবণতা এই বইয়ের পরতে পরতে স্পষ্ট। যে কারণে কখনো বৈষ্ণব পদাবলী, কখনো রবীন্দ্র কবিতা, কখনো বহু পঠিত কোনো উপন্যাস, কখনো বা আধুনিক সঙ্গীত থেকে উপমা-উদাহরণ টেনে এনে বিভিন্ন ময়দানি প্রসঙ্গে তাকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ। সাহিত্যের সঙ্গে ক্রীড়ার এই মেল বন্ধন বাংলাসাহিত্যে অভূতপূর্ব। একটিমাত্র বই লিখে কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদ থেমে যাননি। পরের বছর প্রকাশিত হয়েছে 'রমণীয় ক্রিকেট' (১৯৬১) , তার পরের বছর 'বল পড়ে ব্যাট নড়ে' (১৯৬২), এভাবেই পরের এক দশকে ছখানি ক্রিকেট বিষয়ক বই, যা ক্রীড়াসাহিত্য নামক সংরূপটিকে অন্তত বাঙালী পাঠক মানসে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে সাহায্য করেছে।

প্রসঙ্গত এই পর্যায়ে ক্রিকেট নিয়ে লেখালেখি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা, ব্রিটিশ সরকারের ক্রিকেটের প্রতি পক্ষপাত, নেভিল কার্ডাস প্রমুখ ব্রিটিশ সাহিত্যিকদের উদাহরণ এবং তথাকথিত শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' গোষ্ঠীর ক্রিকেটের সঙ্গে সংযোগ; এই চতুর্মুখী ঘটনার স্রোত কোথাও গিয়ে ক্রিকেট নিয়ে লেখালিখির রাস্তাকে সহজ করেছিল। উপমহাদেশে ক্রিকেটের এই আধিপত্য এবং ক্রীড়াসাহিত্যের সম্প্রসারণে পেছনে এই আধিপত্যের ভূমিকা এই অধ্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাতের দশক এবং মতি নন্দী: বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের পক্ষবিস্তার

এই পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় সাতের দশকে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের হালহকিকত। এই পর্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখক মতি নন্দী। খেলা নিয়ে তাঁর প্রথম গল্প 'অস্থায়ী পলায়ন';

প্রকাশিত হয় ‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৬০ সালে। এরপর আনন্দবাজার ও সাময়িকপত্র ‘এক্ষণ’-এ তিনি খেলা নিয়ে একাধিক ছোটগল্প লেখেন। তবে, এ বিষয়ে মতি নন্দীর প্রথম সার্থক প্রয়াস ১৯৭১-এ, ‘ননীদা নট আউট’, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলার প্রথম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। গতানুগতিক কিশোর রচনার বাইরে ভিন্নস্বাদের এই উপন্যাসটি পাঠক-সমালোচক উভয় মহলেই সপ্রশংস অভিনন্দন কুড়োয়। এরপর খেলা নিয়ে মতি নন্দীর একের পর এক উপন্যাস ‘স্টপার’ (১৯৭২), ‘স্ট্রাইকার’ (১৯৭৩), ‘কোনি’ (১৯৭৪), ‘অপরাজিত আনন্দ’ (১৯৭৫) ইত্যাদি নিয়মিত পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রীড়া সাহিত্যিক হিসাবে মতি নন্দীর আবির্ভাব হলেও, লেখার কাজ আদৌ সহজ ছিল না। কীভাবে খেলার লেখা পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা পেতে পারে তা নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। এই ভাবনার গতিপ্রকৃতি এবং ধরনগুলি এবার আমরা দেখে নিতে পারি।

এক, মতি নন্দী যখন খেলা নিয়ে লিখতে শুরু করলেন, তাঁর প্রথম প্রয়াস এটাই ছিল যে সংশ্লিষ্ট বিনোদনের মনোভাবকে মুলতুবি রেখে, সচেতন সাহিত্যচর্চা হিসাবে খেলাকে তুলে ধরা। নিছক খেলাও যে হতে পারে জীবনের অঙ্গ, খেলাকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারে ব্যক্তিমানুষের নিজস্ব অনুভূতি, তার চাওয়া-পাওয়া দ্বিধা-যন্ত্রণার মুখর সমীকরণ; কার্যত খেলাই যে হয়ে উঠতে পারে জীবন - মতি নন্দী তা দেখাতে চেয়েছিলেন।

দুই, পাঠকের কথা মাথায় রেখে মতি নন্দীকে আরও সাবধানে এগোতে হয়েছে। খেলা নিয়ে সাধারণ পাঠকের মধ্যে প্রায়শই ধারণা এবং অভিজ্ঞতার অভাব লক্ষ করা যায়। এই অস্বস্তি মতি নন্দীকেও ভাবিয়েছিল। সমাধান করতে গিয়ে তিনি যেটা করেছেন, যে খেলা নিয়ে লিখছেন, তার সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু তথ্য আলগোছে পাঠককে জুগিয়ে গিয়েছেন।

তিন, লেখার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করা। সাধারণত খেলার বইগুলিতে, সিনেমাতেও এমন সব ঘটনা বা অ্যাচিভমেন্টের কথা বলা হয়, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে মতি নন্দীর উপন্যাসগুলোয় আমরা খেয়াল করব, তিনি কখনোই এমন চরিত্র বা পরিস্থিতির কথা বলেন না, যা পাঠকের চেনা অভিজ্ঞতার বাইরে। চরিত্রগুলো আমাদের মধ্যে থেকেই উঠে আসে। তাদের জীবনের লক্ষ্যগুলোও এমন কিছু আহামরি নয়। কেউ হয়তো মোহনবাগানের হয়ে শিল্ড ফাইনালে

গোল করতে চায় (স্ট্রাইকার), কেউ জীবনের শেষ ম্যাচটাতে দুর্দান্ত খেলে অবসর নিতে চায় (স্টপার, বুড়ো ঘোড়া), কেউ শুধুই দৌড়তে ভালোবাসে (নারাণ), কেউ সরকারি চাকরির জন্য খেলে (তুলসী), কেউ ন্যাশানাল মিটে সোনা জিততে চায় (কোনি), কেউ রাজ্যস্তরে টেনিস টুর্নামেন্ট জেতার কথা ভাবে (মিনুচিনুর ট্রফি), কেউ বা নিজের ক্রিকেট ক্লাবটিকে বাঁচানোর জন্য সর্বস্ব পণ করে (ননীদা নটআউট)। অর্থাৎ, যা সাধ্যগম্য, যা বিশ্বাসযোগ্য মতি নন্দী সেটুকুই বলেছেন।

চার, বৈচিত্র্য। এমনিতে খেলা নিয়ে যে ধরনের লেখালিখি হয় তাতে বিষয় ও ভাবনাগত বৈচিত্র্যের অভাব থাকে। শুধু তাই নয়, লেখার মধ্যে একই ধরনের বাঁধা ছক বারবার ফিরে ফিরে আসে। প্রায়শই দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াকু একজন ক্রীড়াবিদের কাহিনি শোনানো হয়। কখনও বা দারিদ্র্যের জায়গা নেয় দুর্নীতি, আর মূল প্রোটাগনিস্ট কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে সে সব বাধা টপকে যায়। এই বাঁধা গতের মধ্যে মতি নন্দী আটকে থাকেননি। ‘অপরাজিত আনন্দ’, ‘ননীদা নট আউট’, ‘দলবদলের আগে’, ‘তুলসী’, ‘নারাণ’, ‘দ্বিতীয় ইনিংসের পর’ ইত্যাদি উপন্যাসে তিনি ক্রমাগত চেনা ছককে ভেঙেছেন। বিচিত্র শাখাবিন্যাসে যে মহীরুহ তাঁর লেখনীতে ডালপালা মেলেছে, তাতে আশ্রয় পেয়েছে সবধরনের খেলা, সবধরনের মানুষ।

পাঁচ, ভাষা। বিষয় হিসাবে খেলা যেহেতু প্রচলিত ঘরানাগুলো থেকে আলাদা, তাই এর ভাষা-উপমা-চিত্রকল্পও আসে সচরাচর ব্যবহৃত ভাষাবোধের বাইরে থেকে। কিন্তু তা কেমন? মতি নন্দী বুঝতে পারছিলেন তাঁকে এমন ভাষা নির্বাচন করতে হবে যার সঙ্গে বিষয়ের দূরত্ব থাকবে না। বরং পড়তে পড়তে মনে হবে বিষয় থেকেই ভাষার জন্ম। অর্থাৎ খেলার লেখার জন্য ভাষা হবে আদ্যন্ত খেলাকেন্দ্রিক। যেমন ‘ননীদা নটআউট’ (১৯৭১) উপন্যাসের এক জায়গায় মতি নন্দী লিখেছেন, ‘ননীদার খোলা ঠোঁটদুটি একটা ফার্স্ট ইয়র্কারকে সামাল দেওয়ার মতো ঝটিতি বন্ধ হয়ে গেল।’ (মতি নন্দী, ‘কিশোর সাহিত্য সমগ্র’ (২), পাবলিশিং প্লাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১২, পৃ – ৪৪২) এভাবেই সাধারণ নিত্য জীবনের অভিজ্ঞতা বোঝাতে খেলা থেকে উপমা টেনেছেন মতি নন্দী। জীবন থেকে খেলা নয়, খেলা থেকেই জীবনের উপমা উঠে এসেছে।

আসলে মতি নন্দী বুঝতে পেরেছিলেন চরিত্র এবং ঘটনা সংস্থানে ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিও উপন্যাসে নিহিত রসবোধকে আহত করতে পারে। তাই একজন ক্রীড়াবিদের ভাবনা, মানসিকতা,

সক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব কেমন হয়ে থাকে, বা হওয়া উচিত, তা তাঁকে গভীরভাবে ভাবতে হয়েছে। অতিস্ফূর্ত আবেগকে নিয়মিত সংযমে বাঁধতে হয়েছে। আর কাহিনিগুলোর বিন্যাসে এমন নির্মেদ সুষমা ও সংলগ্নতা বজায় রাখতে হয়েছে, যাতে আদিগন্ত পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখা যায়। বলাবাহুল্য, এইসব বহুবিধ প্রচেষ্টায় মতি নন্দী সফল হয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

আটের দশক: খেলাবিষয়ক পত্রিকা এবং তার লেখকগোষ্ঠী

এই পর্বে আমাদের আলোচনার বিষয় খেলার পত্রিকা। বাংলা খেলার পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল সাতাত্তর সালে অজয় বসুর সম্পাদনায় পাক্ষিক 'ক্রীড়া আনন্দ' প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। পত্রিকাটি বাণিজ্যিক সাফল্য পায়নি। হাওয়া ঘুরল সাতাত্তরের পয়লা মে 'খেলার আসর' প্রকাশিত হওয়ার পর। তারপর একে একে 'খেলার কাগজ', 'খেলার কথা', 'খেলা', 'অলিম্পিক', 'স্টেডিয়াম', 'গড়ের মাঠ', 'গ্যালারি' ইত্যাদি ক্রীড়া পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে; যারা সত্তরের শেষদিক থেকে আশির দশকজুড়ে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে পাঠকমহলে।

মূলত খেলা ঘিরে জনমানসে চাহিদা এবং সেই চাহিদা পূরণের জন্যই আবির্ভাব ঘটেছিল খেলার ম্যাগাজিনের। কিন্তু প্রশ্ন হলো ম্যাগাজিনগুলোতে কী ছাপা হচ্ছিল? এই প্রসঙ্গে খেয়াল করা যেতে পারে সেসময়ের জনপ্রিয়তম দু'টি খেলার ম্যাগাজিন 'খেলার আসর' এবং 'খেলার কাগজ'-এর প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র। 'খেলার আসর'-এ কভার স্টোরি ছিল শ্যাম থাপাকে নিয়ে, লিখেছিলেন অশোক দাশগুপ্ত। মতি নন্দী 'সন্ধ্যাকর' ছদ্মনামে লিখেছিলেন ক্রিকেটের একশো বছর সম্পর্কে। 'স্ট্রাইকার' ছদ্মনামে তপন ঘোষ ময়দানের দুই প্রধানের হালহদিশ সন্ধান করেছিলেন আর ফিফা রেফারি রবীন্দ্রকুমার দত্ত কলম ধরেন রেফারিদের নিয়ে। 'ভাল ফুটবল খেলতে হলে' এই শীর্ষক পরামর্শ দেন দুই ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং প্রসূন ব্যানার্জী। চিরঞ্জীব লেখেন

সাঁতারু বুলা নাথকে নিয়ে। অন্যদিকে 'খেলার কাগজ'-এ প্রথম সংখ্যা থেকেই লিখতে শুরু করেন একঝাঁক ক্রীড়াবিদ। চুনী গোস্বামী, অমল দত্ত, শৈলেন মান্না, অরুণ ঘোষ, সুকুমার সমাজপতি, শান্ত মিত্র প্রমুখ। এছাড়া মতি নন্দী, মুকুল দত্ত, সুপ্রিয় সেন, এবং অশোক দাশগুপ্তর মতো ক্রীড়া সাংবাদিকরা তো ছিলেনই। খেয়াল করলে, প্রথম সংখ্যাতেই দু'টি ম্যাগাজিন তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছিল। প্রথমত, ডেডিকেটেড খেলার ম্যাগাজিন হিসেবেই তারা স্বীকৃত হতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়ত, যতভাবে সম্ভব, সব দিক দিয়েই তারা খেলাকে পাঠকের সামনে হাজির করতে তৎপর। যেকারণে একই পত্রিকার দুই মলাটের মধ্যে রেফারি থেকে সাঁতারু, ময়দানের 'দুই প্রধান' থেকে বাংলার রঞ্জি টিম, রম্য রচনা থেকে ফুটবলের পরামর্শ, ময়দানি গল্প থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদের ছবি, সবটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সব মিলিয়ে খেলাধুলোর একটি সর্বাত্মক চর্চার জায়গা পত্রিকাগুলি তৈরি করতে পেরেছিল। শিল্প-সাহিত্য-রাজনীতি ইত্যাদি কোন কিছু নিয়েই নয়, কেবল খেলা নিয়ে চিন্তিত ছিল তারা। ফলে এদের হাত ধরে খেলাসংক্রান্ত লেখা ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। ভারি প্রবন্ধ, রম্যরচনা, বিতর্ক, ক্রীড়াবিদদের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি তো ছিলই, শারদীয়া সংখ্যায় খেলা নিয়ে গল্প-উপন্যাস-ছড়া-কবিতাও প্রকাশিত হত। পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক দাশগুপ্ত, নির্মলকুমার সাহা প্রমুখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুক্তবাণিজ্য থেকে মিলেনিয়াম: ক্রীড়াসাহিত্যের রঙবদল

এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় নব্বই পরবর্তী সময় মুক্তবাণিজ্য এবং অর্থনীতির ভোলবদল কীভাবে ক্রীড়াসাহিত্যকে প্রভাবিত করলো।

বাংলায় খেলাধুলোর ইতিহাস যদি খেয়াল করা যায়, তাহলে দেখা যাবে দু'টি মাত্র খেলা, ক্রিকেট এবং ফুটবলই আগাগোড়া জনমানসে রাজত্ব করে এসেছে, জনপ্রিয়তার সিংহভাগ বরাদ্দ থেকেছে এদের জন্য। কিন্তু নয়ের দশক থেকে ফুটবলকে পিছনে ঠেলে শীর্ষস্থানটি দখল করে নেয় ক্রিকেট। এর পেছনে দায়ী ছিল বিপুল অর্থ এবং বিজ্ঞাপনের দ্বৈতপ্রয়াস। ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জিতে যাওয়ার পর থেকে, ক্রিকেট প্রায় ধর্ম হিসেবেই পূজিত হয়ে থাকে বৃহত্তর ভারতবর্ষে। আর এই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগায় টিভির বিভিন্ন ব্রডকাস্টিং কোম্পানিগুলি। ক্রিকেট ঘিরে বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের বৃহৎ ব্যবসায়িক সম্ভাবনাকে ক্রমাগত ঘৃতাহুতি দিতে ক্রিকেটের অঙ্গাঙ্গী শরিক হয়ে যায় তারা।

টিভি আসার ফলে স্বভাবতই সাংবাদিকেরা সমস্যায় পড়লেন, কী লিখবেন? সবই তো টিভির পর্দায় দেখে নেওয়া যাচ্ছে। বাধ্য হয়েই তখন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সেইসব বিষয় নিয়ে লেখা শুরু হল, যা টিভিতে দেখায় না। অর্থাৎ কি না মাঠের বাইরের গল্প, যেমন ম্যাচের আগে বা পরে ড্রেসিং রুমের সাতকাহন, দর্শকদের প্রতিক্রিয়া, খেলোয়াড়দের ঠাণ্ডা যুদ্ধ, ম্যানেজারদের ম্যানহ্যান্ডলিং, প্রশাসকদের রাজনীতি, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক, পারিবারিক টানাপোড়েন ইত্যাদি। এই সব বিষয় আগে খেলার লেখালিখিতে ছিল না এমন নয়, কিন্তু আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল না। অথচ সময়ের পরিবর্তনে, এবং টিভির হস্তক্ষেপে তা-ই হয়ে উঠল প্রধান কথাবস্তু।

খেলার লেখালিখির আরও কিছু অনিবার্য পরিবর্তন ক্রমশ আসন্ন হয়ে উঠছিল নয়ের দশকে। সৌজন্যে মুক্ত বাণিজ্য এবং বিশ্বায়নের প্রভাব। অবশিষ্ট পৃথিবীর হালহকিকত, ঘটে চলা বিচিত্র ঘটনার স্রোত, অর্থনীতির রদবদল, মুদ্রাস্ফীতির উল্লম্ফন, কার্যত এই সময় থেকেই আছড়ে পড়তে শুরু করে ভারতের উপরে। বৃহত্তর উপমহাদেশের নিরিখে বিচার করলে এর অভিঘাত মারাত্মক তো বটেই, দীর্ঘস্থায়ীও হয়েছিল। বলাবাহুল্য এর প্রভাবে নব্বইয়ের আগে এবং পরে খেলার জগতও একরকম ছিল না। টিভির কথা তো ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, টিভির পিছু পিছু মাঠে-ময়দানে হাজির হয়েছে বিবিধ মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি, ফ্রাঞ্চাইজি, নরম পানীয় প্রস্তুতকারক সংস্থা। সেই সঙ্গে এসেছে অজস্র রঙচঙে বিজ্ঞাপন, কাঁচা টাকা, বেআইনি আর্থিক

লেনদেন, ম্যাচ গটআপ, বেটিং, ড্রাগ অ্যাডিকশন ইত্যাদি অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি, যা নব্বইয়ের পূর্ববর্তী দশকগুলিতে অপরিচিত না হলেও, প্রকাশ্যে ডালপালা মেলেনি তেমন। বরং থাবা লুকিয়ে অপেক্ষায় ছিল কখন বৃহত্তর বাজার-অর্থনীতির মৃগয়াক্ষেত্র ভারতবর্ষ বেচা-কেনা, সওদার জন্য প্রস্তুত হয়। নব্বইয়ের পরবর্তী সময়ে খেলা তাই নিছক বাইশ গজের বল-ব্যাটের লড়াই নয়, বা নব্বই মিনিটের ঘাম ঝরানো ফুটবল নয়, বরং বিপণনযোগ্য অর্থকরী কাঁচামাল, যা ঝলমলে মোড়কের মধ্যে পুরে পসরা সাজিয়ে বসলে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগারের সুযোগ থাকে। আজকের আইপিএল, আইএসএল, আইবিপিএল, ইএইচএল কার্যত এই ব্যবসায়িক পেশাদারিত্বেরই সফল রূপায়ণ।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা চরিত্র পালটালে ক্রীড়াসাহিত্য স্থির থাকবে এমন ভাবার কারণ নেই। খেলার লেখার ক্ষেত্রে সাংবাদিকেরাই চিরকাল সাহিত্য করেছেন, ফলে প্রেসকপির বশংবদ হিসেবে সেখানেও পালাবদল আসন্ন ছিল। এবং বদলটা এসে গেল নয়ের দশকেই। মতি নন্দী, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব, অশোক দাশগুপ্তের মতো সাত বা আটের দশকের লেখকেরা এই সময় থেকেই ক্রমশ কলম তুলে রাখতে শুরু করলেন, এবং তাঁদের উত্তরসাধক রূপক সাহা, তৃষিত বর্মন, সব্যসাচী সরকার, গৌতম ভট্টাচার্য বা দেবাশিস দত্ত প্রমুখরা যে ধরনের লেখালিখি করলেন, তাতে সাহিত্য নয়, সাংবাদিকতার জায়গাটিই ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে দেখা দিল। বস্তুত, ক্রীড়া সাংবাদিকতারই পরিবর্ধিত ও সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে এই লেখাপত্রগুলিকে ভাবা যেতে পারে। চটুল এবং ফিচারধর্মী সাংবাদিকতাকেই দুই মলাটের মধ্যে বেঁধে সাহিত্য হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হল; এবং মাঠের বাইরের যে গল্প সংবাদপত্রে জাঁকিয়ে বসছিল, তা সাহিত্যের পাতাতেও ক্রমশ আসর জমাল।

উপসংহার

গবেষণার উপসংহারে পুরো আলোচনাটিকে পুনরায় একবার গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। খেয়াল করলে দেখা যাবে ছয় বা সাতের দশকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া পরিসরগুলিতে ভারত ক্রমাগত

সাফল্য পাচ্ছিল, ময়দানের ক্লাবগুলিও ক্রমশ আবেগের মশাল হয়ে দেখা দিচ্ছিল জনমানসে, খেলার মাঠ থেকে চুনী গোস্বামী, শৈলেন মান্না, পঙ্কজ রায়, আরতি সাহার মতো বলিষ্ঠ চরিত্ররা উঠে আসছিলেন ক্রমশ। ফলে খেলা নিয়ে লেখালিখির একটা জমি তৈরি হচ্ছিল ছয় ও সাতের দশকগুলিতে, যার সুফল হিসেবে উঠে এসেছিলেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু বা মতি নন্দীর মতো সাহিত্যিকেরা। সত্তরের শেষ দিক থেকে পরিস্থিতি আবার পালটাতে শুরু করল। সাতাত্তর সালে প্রথম বাংলায় ক্রীড়া পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার পরের চার বছরে প্রকাশিত হয় আরও চারটি পত্রিকা। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় পত্রিকাগুলির বিপুল চাহিদা। আটের দশকে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন একটি পাঠকশ্রেণি, যারা আলাদা করে খেলার পাঠক হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। অশোক দাশগুপ্ত, চিরঞ্জীবের মতো সাংবাদিকেরা ক্রমশ দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেন। ক্রীড়াবিদরাও কলম ধরলেন। খেলার মাঠ, মাঠের রাজনীতি, ম্যাচের বিবরণ, খেলার ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে এই সময়ে প্রচুর লেখালিখি হয়েছে। এরপর নয়ের দশক এবং মিলেনিয়াম। এই সময়ে মুক্তবাণিজ্যের কারণে একটা বড় বদল আসতে শুরু করে খেলার জগতে। টিভি, ইন্টারনেট, আধুনিকতা, বিশ্বায়ন ইত্যাদির প্রকোপে ইউরোপ-আমেরিকার বাজার-অর্থনীতি এবং 'খেলা' হুড়মুড়িয়ে আমাদের দেশে ঢুকে পড়ে। খেলা যে নিছক ঘাম ঝরানো যন্ত্রণার গল্প নয়, এর পেছনেও যে থাকতে পারে বিশাল একটা অর্থনীতির কর্মকাণ্ড, তা নয়ের দশকেই প্রথম বোঝা যায়। সেই সঙ্গে টিভি এসে পালটে দেয় আমাদের খেলা দেখার অভ্যেস। খেলাটা লাইভ দেখে নেওয়ার ফলে নিরুপায় ক্রীড়াসাংবাদিক-সাহিত্যিকরা একরকম বাধ্যত ঝুঁকতে শুরু করেন মাঠের বাইরের গল্প শোনাতে। মূল খেলাটা সরে গিয়ে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন, টানাপোড়েন, ড্রেসিংরুমের গল্প লেখায় উঠে আসতে শুরু করে। সব্যসাচী সরকার, দেবাশিষ দত্ত, গৌতম ভট্টাচার্যের মতো ক্রীড়ালেখকরা এই সময়ের ফসল।

মোটের উপর কিছুটা এমনই ছিল বিভিন্ন যুগে বাংলা ক্রীড়াসাহিত্যের প্রবণতা। বস্তুত খেলার মাঠ এবং মাঠের সমাজনীতি যেভাবে পালটেছে সাহিত্যও পরিবর্তিত হয়েছে সে পথ অনুসরণ করে। বর্তমান গবেষণায় ক্রীড়াসাহিত্যের সেই বিকাশ এবং রূপান্তরের ইতিকথাকে বিবৃত করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি এবং অন্যান্য সূত্রসমূহ

বাংলা গ্রন্থ

১। প্রাথমিক সহায়ক গ্রন্থ:

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ‘কল্লোল যুগ’। দশম প্রকাশ। কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।

অজয় বসু। ‘ফিরে ফিরে চাই’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আজকাল, ২০০৩।

অজয় বসু। ‘মাঠ থেকে বলছি’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, রূপরেখা, ১৯৬০।

অমল দত্ত। ‘যতদিন বাঁচি’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আজকাল, ২০১০।

অরুণ আইন। ‘বন্ধু অমল’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ১৯৬৫।

অরুণ আইন। ‘হলুদে-সবুজে’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, এন সাহা, ১৯৬১।

অশোক চট্টোপাধ্যায়। ‘গোল’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৩।

অশোক দাশগুপ্ত। ‘আরও জোরে’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পুনশ্চ, ১৯৯৪।

অশোক দাশগুপ্ত। ‘খেলার গল্প’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আজকাল, ২০০৩।

অশোক দাশগুপ্ত। ‘উটকো সাংবাদিকের ডায়েরি’। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা, আজকাল, ২০০৯।

অশোক দাশগুপ্ত। ‘ক্রিকেটের টুং টাং’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, প্রজ্ঞা প্রকাশন, ১৯৯৮।

অশোক দাশগুপ্ত। ‘স্বপ্নের গোল’। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা, আজকাল, ২০২১।

অশোক দাশগুপ্ত। ‘হিং টিং ছট’। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, আজকাল, ২০০৩।

অশোক সেন (সম্পা)। ‘কিশোরগল্প – খেলা’ । প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৮।

কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ‘দিশি গান বিলিতি খেলা’। তৃতীয় প্রকাশ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

গৌতম ভট্টাচার্য। ‘কাপমহলা’। বইমেলা সংস্করণ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৫।

গৌতম ভট্টাচার্য। ‘ক্রিকেট শ্যাম্পেনের দুর্ভিক্ষে’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

গৌতম ভট্টাচার্য। ‘বডিলাইনের বিরুদ্ধে’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০০।

গৌতম ভট্টাচার্য। ‘বডিলাইনের যুদ্ধে’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৮।

গৌতম ভট্টাচার্য। ‘সেরা খেলার খুচরো’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

চিরঞ্জীব। ‘ইত্যাদিকথা’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সিটাডেল, ২০১৪।

চিরঞ্জীব। ‘বিশ্বকাপ ফুটবল’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৬।

চুনী গোস্বামী। ‘খেলতে খেলতে’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২।

তৃষিত বর্মন। ‘ম্যাচউইনার’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিসার্স, ২০০৬।

তৃষিত বর্মন। ‘খেল সমগ্র’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬।

দেবাশিস দত্ত। ‘৭০ মিনিটের ফুলঝুরি’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ‘বাংলা ভাষা ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস’। পরিমার্জিত সংস্করণ। দ্বাদশ শ্রেণি, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, জুলাই ২০১৪।

প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘গুরু’। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০২২।

বিনয় মুখোপাধ্যায়। ‘খেলার রাজা ক্রিকেট’। অষ্টম সংস্করণ। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০।

বিনয় মুখোপাধ্যায়। ‘মজার খেলা ক্রিকেট’। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩।

মতি নন্দী। ‘কিশোর সাহিত্য সমগ্র’ (১)। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পাবলিশিং প্লাস, ২০১২।

মতি নন্দী। ‘কিশোর সাহিত্য সমগ্র’ (২)। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, পাবলিশিং প্লাস, ২০১২।

মতি নন্দী। ‘দশটি উপন্যাস’। পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯।

মতি নন্দী। ‘দ্বিতীয় ইনিংসের পর’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৫।

মানস চক্রবর্তী। ‘মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল রেষারেষি’। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩।

রূপক সাহা। ‘কোথায় তুমি ঋক’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০।

রূপক সাহা। ‘গোলকি’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

রূপক সাহা। ‘নায়ক যখন কুশ’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, নাথ পাবলিশার্স, ২০০৬।

সিদ্ধার্থ ঘোষ (সম্পা)। ‘খেলা আর খেলা’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২।

সুনীল গাভাসকর। ‘আইডলস’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৮৪।

সুভাষ ভৌমিক। ‘গোল’। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০২২।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ‘ব্যাক সেন্টার’। প্রথম দে’জ সংস্করণ। কলকাতা, দে’জ, ২০২৩।

সব্যসাচী সরকার। ‘লর্ডস থেকে টনটন’। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।

সব্যসাচী সরকার। ‘সবার শচীন আমাদের সৌরভ’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৯।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী। ‘আমাদের সেই শহরে’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯।

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী। ‘পাতাঝরার মরশুমে’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ‘ইডেনে শীতের দুপুর’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ‘ক্রিকেট সমগ্র’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২০।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ‘বাছাই ক্রিকেট’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, মণ্ডল বুক হাউস, ১৪০৬।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৮।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ক্লাবের নাম মোহনবাগান’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৮।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘চ্যাম্পিয়ন’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৮।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘মারাদোনা মারাদোনা’। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৮৬।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘সুন্দর ক্রিকেট’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, পত্রভারতী, ১৯৮২।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ‘বক্সার রতন’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪।

২। গৌণ সহায়ক গ্রন্থ:

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ‘মৃগ নেই মৃগয়া’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৬৫।

অমর্ত্য সেন। ‘ফার্স্ট বয়দের দেশ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘খেলা যখন ইতিহাস’। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১৯।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘বাঙালির ঐতিহাসিক ফুটবল যুদ্ধ’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, সেতু প্রকাশনী, ২০১১।

কৃত্তিবাস ওঝা। ‘রামায়ণ’। সম্পাদক – সুবোধচন্দ্র মজুমদার। পুনর্মুদ্রণ। দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ২০২০।

চুনীলাল মণ্ডল। ‘শারীরশিক্ষা পরিচয়’। তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা, বীণাপাণি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

ড. রাজর্ষি কয়াল। ‘যোগ শিক্ষা’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, ক্লাসিক বুকস, ২০১৮।

নির্মলকুমার সাহা। ‘ক্রীড়াঙ্গনের বিস্মৃত বাঙালি তারকাদের গল্প’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, উত্তরণ পাবলিশার্স, ২০২১।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ‘চলমান জীবন’ (দ্বিতীয় পর্ব)। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ১৩৬১।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড’। অষ্টম মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৩90।

বেরী সর্বাধিকারী। ‘আমার দেখা ক্রিকেট’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৫৭।

বিপিনবিহারী গুপ্ত। ‘পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে’জ, ২০১৬।

বোরিয়া মজুমদার এবং নলিন মেহ্‌তা। ‘ভারতবর্ষ আর অলিম্পিক’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০২০।

বোরিয়া মজুমদার। ‘শতশিল্পে আলোকিত ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস’। দ্বিতীয় প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৯।

মতি নন্দী। ‘খেলা সংগ্রহ’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স, ২০১১।

মতি নন্দী। ‘ছড়িয়ে ছিটিয়ে’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, আজকাল, ২০০১।

মননকুমার মণ্ডল (সম্পা)। ‘পার্টিশন সাহিত্য: দেশ-কাল-স্মৃতি’। দ্বিতীয় প্রকাশ। কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৯।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কাহিনী, প্রথম খণ্ড’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৯৭৪।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড’। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ১৯৭৬।

মানস চক্রবর্তী (সম্পা)। ‘মতি নন্দী’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৬।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। ‘মহাভারতের ছয় প্রবীণ’। একাদশ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭।

রাখাল ভট্টাচার্য। ‘কলকাতার ফুটবল’। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, ইস্টলাইট বুক হাউস, ১৯৫৫।

রাজশেখর বসু। ‘চলন্তিকা’। সপ্তম সংস্করণ। কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্‌স লিঃ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

রাজশেখর বসু। ‘রামায়ণ’। সপ্তদশ মুদ্রণ। কলকাতা, এম সি সরকার আন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২৬।

রাজশেখর বসু। ‘মহাভারত’। পঞ্চদশ মুদ্রণ। কলকাতা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২২।

যোগেশচন্দ্র বাগাল এবং শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। ‘হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত’। সংকলক – ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী এবং অশোক উপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, প্রাচী প্রকাশনী, ২০০০।

শ্যামসুন্দর ঘোষ। 'খেলার জগৎ'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১।

সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'সীমান্ত বাংলার লোকক্রীড়া'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০১।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড)'। প্রথম প্রকাশ। নিউ দিল্লী, সাহিত্য অকাদেমী, ১৯৪৬।

বাংলা পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩/০১/২৩।

অমৃতলোক পত্রিকা। ৩১ তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ২০০৫। ১০৫ নং ইস্যু।

কোরক সাহিত্য পত্রিকা। প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। পৌষ-চৈত্র ১৪১৯।

পাক্ষিক দেশ। ২৯ মে, ১৯৯৯।

পাক্ষিক দেশ। ২৯ আগস্ট, ১৯৯৩।

প্রমা, মতি নন্দী সংখ্যা। ২০০৮।

ঐহিক পত্রিকা। বইমেলা, ২০১৪।

খেলার আসর। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ১লা মে, ১৯৭৭।

খেলার কথা। ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০।

খেলার কথা। ১৬ জুন, ১৯৭৮।

রোববার। প্রতিদিন। ২৮ মে, ২০২৩।

ভারতবর্ষ। ১২ বর্ষ, ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা। চৈত্র, ১৩৩১।

শুকতারা। ৩৮ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৯২।

শুকতারা। ৩৯ বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৯৩।

ইংরেজি গ্রন্থ

Bhattacharyya, A.K.. *Dimensions of Physical Education.* 2nd edition. Kolkata, Classique Books, 2017.

Bessar, Arnold R. *The Madness in Sports.* 2nd edition. New York, Charles Press, 1977.

Basam, A. L..*THE WONDER THAT WAS INDIA.* Calcutta, Rupa Co., Reprint – 1986.

Chatterjee, Partha. *The Black Hole of Empire: History of a Global Practice of Power.* Princeton, Princeton University Press, 2011

Deshpande, S. H.. *Physical Education In Ancient India.* 1st edition. Delhi, Bharatiya Vidya Prakash, 1992.

Ed. Majumdar Boria and Morgan J. A.. *Introduction to Sport in South Asian Society.* London, Routledge, 2005

Galeano, Eduardo. *Football in Sun and Shadow.* 1st edition. London, Penguin Books, 2018.

Gavaskar, Sunil. *The Sunil Gavaskar Omnibus.* 1st edition. New Delhi, Rupa Publications, 1999.

Guha, Ramachandra. *A corner of a Foreign Field: The Indian History of A British Sport.* 1st edition. Delhi, Penguin Random House, 2002.

Guha, Ramachandra. *India After Gandhi.* 1st Edition. London, Pan Macmillan, 2007.

Guha, Ramachandra. *The Commonwealth Of Cricket.* 1st edition. Delhi, Fourth Estate, 2020.

Guha, Ramachandra (ed). *The Picador Book of Cricket.* 1st edition. London, Picador, 2001.

Hillenbrand, Laura. *Seabiscuit: An American Legend.* 1st edition. New York, Ballantine Books. June 1999.

Haigh, Gideon. *The Cricket War.* 2nd Edition. Tasmania, Text Publishing House, 2017.

James, C.L.R.. *Beyond a Boundary.* 1st edition. London, Vintage Classics, 2019.

Karunatilaka Shehan. *Chinaman: The Legend of Pradeep Mathew.* 1st edition. New Delhi, Random House, 2011

Majumdar Boria. *Cricket in Colonia India (1780-1947).* 1st edition. London, Roultedge, 2008.

Majumdar Boria and Bandyopadhyay Kaushik. *Goalless: The story of a Unique Footballing Nation.* 1st edition. New Delhi, Penguin, 2006.

Pindar. *Selected Odes.* Edited by Thomas D. Seymour. Boston, Ginn & Company, 1889.

Sen Ronojoy. *Nation At Play.* 1st edition. Gurgaon, Penguin Viking, 2015.

সামাজিক মাধ্যম/ ব্লগ/ পোর্টাল/ ওয়েবসাইট

১। ইংরেজি প্রবন্ধ

Dimeno, Paul. ‘Literature nd Sports History: A Review of Recent Contribution’, Sports in History, March, 2009.

(https://www.researchgate.net/publication/41529607_Literature_and_Sports_History_A_Review_of_Recent_Contributions)

Dowson, Katherine. 'Victory or Death: Ancient Olympic Sports', VFW (Veterans of Foreign Wars), August, 2012. (https://digitaledition.qwinc.com/publication/?i=118061&article_id=1112179&view=articleBrowser)

Orwell, George. 'The Sporting Spirit'. London Tribune. Dec 1945 (https://www.orwell.ru/library/articles/spirit/english/e_spirit)

Williams, James. 'Sports + Literature = Sports Literature'. The Modern spectator. July 2013 (Sports Literature.Modern%20Spectator.html)

Vanderwerken, David L. 'SPORTS IN MODERN AMERICAN LITERATURE'. John Hopkins University. College Literature, Spring, 1976, Vol. 3, No. 2. (https://www.jstor.org/stable/25111127)

২। বাংলা প্রবন্ধ

প্রতীক। 'বড় ক্রিকেটার নয়, বিরাট ব্র্যান্ডে মোহিত নিউ ইন্ডিয়ার জনগণমন'। ইনস্ক্রিপ্ট, ২৪/০১/২২। (https://inscript.me/its-not-cricketer-virat-kohli-this-is-brand-virat-which-hypnotized-new-india/)